রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি ছোট গল্প

Collected and Typeset in Bengali-Omega TEX by Lakshmi K. Raut

সূচিপত্র

১	ছুটি	**3**
২	কাবুলিওয়ালা	**7**
৩	পোস্টমাস্টার	**14**
৪	বলাই	**19**

১

ছুটি

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Typeset in this format using Bengali-Omega for Tex by Lakshmi K. Raut

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তির মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল ; নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ট মাস্তুলে রুপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল ; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলে গড়াইয়া লইয়া যাইবে ।

যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যক-কালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিথা বোথ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়াই বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল ।

কোমোর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ট মাখন লাল গম্ভীরভাভে সেই গুঁড়ির ঊপরে গিয়া বসিল ; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল ।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না ; এই অকাল-তত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল ।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, দেখ , মার খাবি । এবেলা ওঠ ।

সে তাহাতে আরো একটু নড়িয়াচড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল । অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল সাহস হইল না । কিন্তু, এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনই উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে, কিন্তু করিল না ; কারণ, পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আরো একটু বেশি মজা আছে । প্রস্তাব করিল, মাখনকে শুদ্ধ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক ।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে ; কিন্তু আন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্বাবনাও আছে, তাহা তাহার ক্ষিবা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই ।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ব করিল মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো । গুঁড়ি একপাক-ঘুরিতে-না-ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য গৌরব এবং তত্বজ্ঞান-সমেৎ ভূমিসাৎ হইয়া গেল ।

খেলার আরম্বেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া আন্যান্য বালকেরা বিশষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল । মাখন তৎক্ষনাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের ওপরে গিয়া পড়িল,

একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল । তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল । খেলা ভাঙিয়া গেল ।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুএর উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল ।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল । একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁপ এবং পাকা চুললইয়া বাহির হইয়া আসিলেন । বালাককে জিজ্ঞাসা করিলেন, চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায় ।

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, ' হোথা ।' কিন্তু কন দিকে যে নির্দেশ করিল, কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না ।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা ।

সে বলিল, জানিনে । বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহনে প্রবৃত্ত হইল । বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন । অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, ফটিকদা, মা ডাকছে ।

ফটিক কহিল, যাব না ।

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল ; ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল ।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, আবার তুই মাখনকে মেরেছিস !

ফটিক কহিল, না, মারি নি ।

ফের মিথেয কথা বলছিস !

কখখনো মারি নি । মাখনকে জিজ্ঞাসা করো ।

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, হাঁ, মেরেছে ।

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না । দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, ফের মিথেয কথা !

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্টে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলান । ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল ।

মা চিৎকার করিয়া কহিলেন, আয়ঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস !

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কী হচ্ছে তোমাদের । ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে । বলিয়া গড় করিয়া প্রনাম করিলেন ।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন । ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই । আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভর তাহার ভগিনিকে দেখিতে আসিয়াছেন ।

কিছুদিন বেশ সমারোহে গেল । অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাহার ভগিনিকে ছেলের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন । উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন ।

তাঁহার ভগিনি কহিলেন, ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে ।

শুনিয়া বিশ্বম্বর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন ।

বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন ।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন রে ফটিক, মামার সাথে কলকাতায় যাবি ?

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, যাব ।

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহের মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল কোন দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায়, কি কী একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায় গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুন্ন হইলেন ।

কবে যাবে, কখন যাবে করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল ; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না ।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য বশত তাহার ছিপ ঘড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল ।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই আনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপ্রিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরেরে এত বয়স হইল, তবু কিছু মাত্র যদি জ্ঞানকান্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরেরচ ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রেই প্রগলভতা। হঠাৎ কাপড়চোপোড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানরূপে বাড়িয়া উঠে ; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিস্টতা সহসা চলিয়া যায় ; লোকে সে জন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ে কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে খাপ খাইতেছে না ; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যাক্তির নিকট হইতে স্নেহ ক্ষিবা সখ্যতা লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না ; কারন সেটা সাধারনে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মত হইয়া যায়।

অতএব এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চিরিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মত বিঁধে। এই বয়সে সাথারনত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দূর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারনা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সব চেয়ে

বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন তাহা হইলে সে মনের আনান্দে যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত অবশেষে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না । এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে। একটুকু পড়োগে যাও। তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াবার সেই মাঠ, তাইরে নাইরে নাইরে না করিয়া উচ্ছৈস্বরে স্বরচিত রাগিনি আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংগকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই-সব দল-বল উপদ্রব স্বাধীনতা, এবং সর্বপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মত একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধুলিসময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক মা মা ক্রন্দন সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে, সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগলুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত ; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মামা, মার কাছে যাব। মামা বলিয়াছিলেন,স্কুলের ছুটি হোক।

কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা আন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অশহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপ্রাধীর মতো গিয়া কহিল, বই হারিয়ে ফেলেছি।

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, বেশ করেছ! আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।

ফটিক আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা ও দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

২

কাবুলিওয়ালা

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Typeset in this format using Bengali-Omega for Tex by Lakshmi K. Raut

আমার পাঁচবছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না । পৃথিবীতে জন্মগ্রহন করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার প্র হইতে যতক্ষন সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না । তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না । মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না । এই জন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে ।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদ হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না । না ?"

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনিত হইল । "দেখো বাবা ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে । তাই বৃষ্টি হয় । মা গো, ভোলা এত মিছি মিছি বকতে পারে । কেবলই বকে, দিন রাত বকে ।"

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছু মাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাবা, মা তোমার কে হয় ।"

মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা ; মুখে কহিলাম, "মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা করগে যা । আমার এখন কাজ আছে ।"

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শেব আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে আগডুম-বাগডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল । আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চন মালাকে লইয়া আন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্ন বর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন ।

আমার ঘর পথের ধারে । হটাৎ মিনি আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা ।"

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে দুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতে ছিল তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যা রত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উর্ধশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল । আমি ভাবিলাম,

এখনই ঝুড়ি ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না ।

কিন্তু, মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল অমনি সে উর্ধশ্বাসে আস্থপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না । তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মত ছিল যে, ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে ।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চন মালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না ।

কিছু কেনা গেল । তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল । আবদর রহমান, রুস, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল । আবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমার লেড়কি কোথায় গেল ।"

আমি মিনির আমুলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার আভিপ্রায়ে তাহাকে অন্থপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম সে আমার গা ঘেঁসিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্ধিগ্ধ নত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই নিল না, দ্বিগুন স্নেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল । প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল ।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির ওপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে, এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামত ও দো আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে । মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের আভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই । আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম কিসমিসে পরিপূর্ণ । আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, "উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ । অমন আর দিও না ।" বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম । সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল ।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোল-আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে ।

মিনির মা একটা স্বেত চকচকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্তসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এই আধুলি কোথায় পেলি ?"

মিনি বলিতেছে, "কাবুলিওয়ালা দিয়েছে ।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে তুই আধুলি কেন নিতে গেলি ।"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাই নি, সে আপনি দিলে ।"

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম । সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে ।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে যথা রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা,

তোমার ও ঝুড়ির ভিতর কি ।“

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, “হাঁতি ।“

অর্থাৎ, তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তার পরিহাসের সূক্ষ্মমর্ম । খুব যে বেশি সুক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই প্রিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক আনুভব করিত এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য কেখিয়া আমার বেশ লাগিত ।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল । রহমত মিনিকে বলিত “খোঁখী, তোমি সসুবাড়ি কখুন যাবে না ।“

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল শ্বশুরবাড়ি শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশূ মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই । এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না । আথাচ কথাটার একটা কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ, সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, “তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে ?”

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, “হামি সসুরকে মারবে ।“

শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোন এক অপরিচত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত ।

এখন শুভ্র শরত কাল । প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগবিজয়ে বাহির হইতেন । অমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেই জন্যই আমার মনটা পৃথিবী ময় ঘুরিয়া বেড়ায় । অমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে । একটা বিদেশের নাম শুনলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে ।

এদিকে অমি এমনই উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয় । এইজন্য সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমনের কাজ হইত । দুই ধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচচ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্টের শ্রেণী চলিয়াছে ; পাগড়িপরা বণিক ও পথিকেরা কেহ-বা উটের পরে, কেহ-বা পদব্রজে ; কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে সেকেলে চকমকি-ঠোকা বন্ধুক কাবুলি মেঘমন্দস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত ।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক ; রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলে তাঁহার মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেশজ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে । এই পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়োপোকা আরশোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ এতদিন (খুব বেশিদিন নহে) পৃথিবীতে বাসকরিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই ।

রহমত কাবুলিওয়ালা স্বমন্ধে তিনি সম্পুর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না । তাহার প্রতি বিশেশ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বার বার আনুরোধ করিয়াছিলেন । আমি তাহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া

দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটি কতক প্রশ্ন করিলেন, "কখনো কাহারও ছেলে চুরি যায় না । কাবুল দেশে কি দাস-ব্যবসা প্রচলিত নাই । একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোট ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া কি একেবারে অসম্ভব ।"

আমাকে মানিতে হইল, ব্যপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে, কিন্তু অবিশ্বাস্য । বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এই জন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল । কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না ।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায় । এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে । বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয়, কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায় । দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে । সকালে যেদিন আসিতে পারে না সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে । আন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলে-ঢালা-জামা-পায়জামা পরা সেই ঝোলাঝুলিওয়ালা মস্ত লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয় । কিন্তু, যখন দেখি মিনি কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই আসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে ।

একদিন সকালে আমার ছটো ঘরে বসিয়া প্রুফশিট সংশোধন করিতেছি । বিদায় লইবার পূর্বে আজ দুই-তিন দিন হইতে শীতটা খুব কনকনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে । জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপ্টুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে ; বেলা বোধ করি আটটা হইবে, মাথায়-গলাবন্ধ-জড়ানো ঊষচরগণ প্রাতভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় কক্লে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে । এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল ।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতদই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে তাহার পশ্চাতে কৌতুহলী ছেলের দল চোলিয়াছে । রহমতের গাত্রবস্তে রক্ত চিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা । আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম ; জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী ।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিত ধারিত মিথ্যা পুর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে তাহাকে এক ছুরি বসিয়া দিয়াছে ।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারুপ আশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল ।

রহমতের মুখ মুহুর্তের মধ্যে কৌতুক হাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, সুতারাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না । মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে ?"

রহমত হাসিয়া কহিল, "সেখানেই যাচ্ছে ।"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, "সসুরাকে মারিতাম, কিন্তু কি করিব, হাত বাঁধা ।"

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল ।

তাহার কথা একপ্রাকার ভুলিয়া গেলাম । আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না ।

আর, চঞ্চল হৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জা জনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয় । সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল । পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল । এমন-কি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না । আমি তো তার সংগে একরকম আড়ি করিয়াছি ।

কত বৎসর কাটিয়া গেল । আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে । আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে । পূজার ছুটির মধ্যে তাহার বিবাহ হইবে । কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে ।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে । বর্ষার পরে এই শরতের নূতন ধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানো নির্মল সোনার মত রং ধরিয়াছে । এমন-কি, কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর আপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবন্য বিস্তার করিয়াছে । আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে । করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে । আজ আমার মিনির বিবাহ ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা । উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে ; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে ; হাঁকডাকের সীমা নাই । আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল ।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না । তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে সে পূর্বের মতো সে তেজ নাই । অবশেষে তাহার হাঁসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম ।

কহিলাম, "কী রে রহমত, কবে আসিলি ?"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি ।"

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট করিয়া উঠিল । কোনো খুনিকে কখোনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্থকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল । আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলে ভালো হয় ।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও ।"

কথাটা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁকিকে একবার দেখিতে পাইব না ?"

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল মিনি সেই ভাবে আছে । সে যেন মনেকরিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই কৌতুকবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনরূপ ব্যতয় হইবে না । এমন-কি, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরন করিয়া সে এক বাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিসমিস বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে

চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না ।

আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না ।"

সে যেন ক্ষুণ্ণ হইল । স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে বাবু সেলাম বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল ।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা হইল । মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময় দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে ।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিসমিস বাদাম খোঁকির জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন ।"

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল ; কহিল, "আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে আমাকে পয়সা দিবেন না । বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কি আছে । আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁকির জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না ।" এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল । বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল ।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি হাতের ছাপ । ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে । কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে ।

দেখিয়া আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল । তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা । তাহার পর্বতবৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্ত চিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল । আমি তৎক্ষনাৎ তাহাকে অন্থপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম । অন্থপুর ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল । কিন্তু, আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না । রাঙা-চেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না । আবশেষে হাসিয়া কহিল, "খোঁকি, তুমি সসুরবাড়ি যাবিস ?"

মিনি এখন শ্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিলনা, রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল । কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল । মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল ।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল । সে হঠাৎ বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে তাহাকে পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না । এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে । সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতর বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল

।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম । বলিলাম, “রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও ; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক ।“

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল । যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেটিরক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্থপুরে মেয়েরা আত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ।

অগ্রহায়ণ ১২৯৯

১

৩

পোস্টমাস্টার

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Typeset in this format using Bengali-Omega for Tex by Lakshmi K. Raut

প্রথম কাজ আরম্ব করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্টাপিস স্থাপন করিয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গন্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাসটারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জংগল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরষত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়াজীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায় - কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নব জীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাসটারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুন্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্ছেস্বরে গান জুড়িয়া দিত — যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবি হৃদয়েও ঈষতহৃতকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জালিয়া পোস্টমাসটার ডাকিতেন -রতন। রতন

দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না; বলিত, কি গা বাবু, কেন ডাকছ। পোস্টমাসটার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনই চুলা ধরাতে যেতে হবে - হেঁশেলের -

পোস্টমাসটার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন - একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাসটার ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, অচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে? সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহার মধ্যে দৈবাতদুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিস্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাসটারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটো ভাই ছিল - বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ কারিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল - অনেক গুরুতর ঘাটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসি ব্যননজন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত - তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন - ছোটোভাই মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাইমনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোগ দিগকে মা দিদি বলিয়া চির-পরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষততপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে এক প্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপর আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুন স্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না - সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মষৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত - হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহ পুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরে অর্থও কতকটা রূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, রতন। রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া

দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল - হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দাদাবাবু, ডাকছ? পোস্টমাস্টার বলিলেন, তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব। বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবন মাসে বর্ষণের অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ - নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাথকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মত যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঁজিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন - বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল - 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে ? পোস্টমাস্টার কাতর স্বরে বলিলেন, শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না - দেখতো আমার কপালে হাত দিয়ে।

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ীনারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থের উল্লেখ করিয়া ততক্ষণাতকলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগ সেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পুর্ববতআর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে মাঝে উকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন তখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে আসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পূরানো পড়া পড়িল। উদদবেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে ?

পোস্টমাস্টার বলিলেন, রতন কালই আমি যাচ্ছি।

রতন। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামননজুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি

যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোন কথা কহিল না। মিটটমিটটকরিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির ষরার উপর টপপটপপকরিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্না ঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্য দিনের মতো তেমন চটটপটহইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে ?

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, সে কি করে হবে। ব্যাপার যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বোঝানো অবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাষ্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল – 'সে কী করে হবে।'

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাথকালে আবশ্যক হয় এই জন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়া ছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন; আমি যাচ্ছি বলেতোকে কিছু ভাবতে হবে না।

এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর কনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছবসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে নাই, আমি থাকতে চাইনে।

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।

কিছু পথ খরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্য কাওকে কিছু ভাবতে হবে না -বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফরিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতে চারি দিকে ছল ছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন - একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহতঅব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি' - কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর

বেগে বহিতেছে , গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকুলের শ্মশান দেখা দিয়াছে – এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোন তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্টাঅপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে – সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয় ! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমানকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহু পাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন যমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যকুল হইয়া উঠে।

১২৯৮

৪

বলাই

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Typeset in this format using Bengali-Omega for Tex by Lakshmi K. Raut

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক ক'রে নিয়েছে - অমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়াছে পুরে অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধ'রে রেখেছে। যেমন রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত ক'রে তোলে — তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না - কিন্তু সংগীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য-সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে উঠে, কোনোটাতে মধ্যম, কোনেটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই - তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মুল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়ানো নয়। পুর্বদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবন-অরন্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝম ঝম ক'রে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেল বেলাকার রোদ্দুর প'ড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে কি যেন কী-একটা সংগ্রহ ক'রে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্মৃত হয়ে ওঠে, ভ'রে ওঠে তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা ব'সে ব'সে আপন-মনে কথা কইতে ইচ্ছা করে, যা কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে এক-জোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। অমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে পর্যন্ত নেমে গিয়েছে, সেইটে দেখে ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে। প্রায় তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত - সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত - গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত

আর ও খিল খিল ক'রে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পর প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনারঙের রোদ্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে ও কাওকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়া তলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছম ছম করে এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়; তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, এক যে ছিল রাজাদের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠেছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, তার পরে? তার পরে? তার পরে? তারা ও চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য-গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী-যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, তোমার নাম কী, হয়তো বলে তোমার মা কোথায় গেল। বলাই মনে মনে উত্তর করে, আমার মা তো নেই।

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোন মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্য ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকী পাড়ে; ও কিছু বলতে পারে না। সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস করে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয় ওর কাঁদতে লজ্জা করে, পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যে দিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হলদে নামহারা ফুল, অতি ছোটো-ছোটো; মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল; পাখিতে-খাওয়া নিম ফলের বিচি পড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে বসে তার গলা জড়িয়ে বলে, " ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার গাছগুলো যেন না কাটে।"

কাকি বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মত বকিস। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।"

বলাই অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যাথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই ওর চারিদিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে সে দিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সুর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে দিন-

রাত্রে। গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে; তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, আমি থাকব, আমি থাকব। বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবন্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, আমি থাকব। সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-এক-রকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেঁসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী।"

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হায় রে, বলাই ভুলকরেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগত ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবামাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত করে দেবে।

আমি বললুম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।"

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা। বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেল না।"

আমি বললুম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।"

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, "ওগো শুনছ! আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই যদি না দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু এখন রোজই চোখে পড়ে। বছর-খানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাওকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠেছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরো দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতুকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, "নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারাআনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।"

কিন্তু কাটবার কথা বললেই আঁতকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, "আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।"

আমার বৌদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তার কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলিতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয় তার পরে বিলেতে নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর শূন্য।

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া এক-পাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এত দিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা বসে বসে চিন্তা করেন।

কোনো-এক সময়ে দেখলুম, লক্ষীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে এতদূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, "কাকি, আমার সেই শিমুল্গাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।"

বিলেতে যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, "ওগো, শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন।"

বলাইয়ের কাঁচা হাতের চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, "সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।"

বলাইয়ের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেকদিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ি ছিঁড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত করে দিলে।

গাছ যে ছিল তার বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

১